দৈনিক জনকণ্ঠ

96

তারিখ ...২৮ APR. ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২....

শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার দায়িত্ব কে নেবে?

একেএম শাহনাওয়াজ

আমাদের মান্যবর রাজনীতিবিদগণ হয়ত সত্য কথনে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। তবু বোধ করি বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবেন না যে, স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে ক্রমাগত রাজনীতির অঙ্গন বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করতে তাঁরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালন করছেন। এই মান্যবরগণ বহুধা বিভক্ত থাকেন। কারও ব্যানার-পরিচিতি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি বলে, কেউ জাতীয়তাবাদী শক্তি, কেউ ধর্মরক্ষায় পাবন্দ ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবুও রাজনীতির অক্টোপাসে পড়ে ক্রমাগত লাঞ্ছিত হচ্ছে স্বদেশ। অন্ধকারের চোরাগলি পথে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত।

অক্টোপাসে পড়ে ক্রমাগত লাঞ্ছিত হচ্ছে স্বদেশ। অন্ধকারের চোরাগলি পথে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত।

স্বাধীনতার পর দু'যুগ পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে অনেক সরকারের পালা বদল হলো এদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রে। প্রতিবারই নতুন করে সশস্ত্র হলো শিক্ষাঙ্গন। রাজনৈতিক দলগুলো যেন আরেকটু উত্তাপ ছড়াল। শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রাঙ্গনে পরিণত হতে থাকল প্রতিনিয়ত। ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রজ্ঞাবান ছাত্র নেতাদের তখন জাতীয় দলগুলোর লেজুড় ভাবা হতো না। বরঞ্চ ছাত্র নেতাদের ইতিবাচক স্লোগান ধারণ করে জাতীয় নেতৃত্ব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এখন সর্বত্র আকাল চলছে এই মেধা আর মননশীলতার। আমাদের রাজনৈতিক গতি ধারাকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করলে সকলেই বুঝতে পারি যে, মুখে যাই বলুক দেশপ্রেম এখন আর কারও মোক্ষ নয়, মুখ্য হচ্ছে গোষ্ঠীতন্ত্র, দলতন্ত্র, ক্ষমতায় যাওয়াতন্ত্র আর ক্ষমতায় টিকে থাকা তন্ত্র। আর এই লক্ষ্যে পৌছার জন্য যা যা করণীয় তা তারা করে যাচ্ছে সমস্ত যুক্তিতর্ক আর মানবিকতার প্রশ্ন এড়িয়ে। তাই আমাদের দলগুলো কি সরকারী, কি বিরোধী, তাদের লক্ষ্যে পৌছার জন্য লাঠিয়াল বানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনের কতিপয় তরুণকে। তারা এক দুঃসহ বন্যতায় গ্রাস করছে সমস্ত পবিত্রতা। অস্ত্রভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন। স্বয়ং মহামান্য রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ এই বন্যতা হতে জাতিকে মুক্ত করার জন্য বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু কোন ইতিবাচক সাড়া মিলছে না কোন তরফ থেকে।

অস্ত্র তরুণকে বিবেকবর্জিত বর্বরে পরিণত করতে পারে। তা তো স্বতঃসিদ্ধ। রাশ টানতে চাইলেও এখন আর লাগামের নাগাল পাওয়া যাবে না। কোন শাসন নেই বরঞ্চ উৎসাহ আছে বলেই অবৈধ অস্ত্র চোখের সামনে বিচরণ করতে পারে। রাজনৈতিক মতবিরোধ বা ক্ষমতা বিস্তারের জন্যই নয় বর্বরতা যখন ছেয়ে যায় তখন নানা ছুতোয়ও ব্যবহৃত হতে পারে অস্ত্র। গত ২৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে যে পৈশাচিক অস্ত্রবাজি হয়ে গেল তা এই মন্তব্যকেই সমর্থন করে। প্রাণঘাতী ও সভ্যতা হত্যাকারী এই অস্ত্র মহড়ার পিছনে বাহ্যত কোন দল-উপদল বা কোন্দলীয় ঝগড়া নয়— শোনা যায় এর সূত্রপাত কোন ছাত্রীকে উত্যক্ত করার মতো ঘটনা থেকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অস্ত্র রাখা বা প্রদর্শন করা কিংবা মানুষ হত্যা করা এসব সন্ত্রাসীর যেন জন্মগত অধিকার। দলের লেবাস পরা চিহ্নিত ক্যাডার বাহিনী প্রকাশ্যে বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র বুক রক্তাক্ত করে। আর তাদের কেন্দ্রীয় পরিচালকবৃন্দ তাতে দুঃখিত তো হন-ই না— বরঞ্চ 'আমার দল দায়ী নয়' বলে নির্লজ্জের মতো বক্তব্য দেন।

সঙ্গত ঃ কারণেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হওয়ার বোধ করি কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ অস্ত্রমুক্ত করার দায় বা দায়িত্ব কারও আছে বলে মনে হয় না। ফাঁকা বুলি ছাড়া কোন পক্ষ যে সত্যিকার অর্থে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত দেখতে চায় তা বোঝা যায় না। এখন সর্বত্রই প্রশ্ন, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার দায়িত্ব কোন্ পক্ষের। যদি শিক্ষাঙ্গন বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি তো দায়িত্ব নেয়ার মতো ভেতরে ও বাইরে দুই ধারার পক্ষ রয়েছে। ভেতরে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও হল প্রশাসন। আর বাইরে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সরকার।

বর্তমান সময়ে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের যে চরিত্র প্রকৃতঅর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার প্রশাসন এক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ। অসহায়ের মতো অঘটন প্রত্যক্ষ করা ছাড়া প্রশাসনের করণীয় বিশেষ কিছু নেই। আসলে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসীরা অনেকটা রোবটের মতো। সরকারী বা বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় তারা বেড়ে ওঠে। রিমোটকন্ট্রোল নেতৃত্বের হাতে— ক্যাম্পাসের বাইরে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের কর্তৃপক্ষের অসহায় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হলসমূহ। তাই হল দখল সরকারী বা বিরোধী দলের ছাত্রবাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এর পরে ক্ষমতা প্রদর্শন, বিপক্ষ দলের ওপর চড়াও হওয়া, চাঁদাবাজিকে গতিশীল রাখা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাত শক্ত করার জন্য বা ক্ষমতার ভারসাম্যতা রক্ষা করতে হলসমূহে অস্ত্রের যোগান বাড়তে থাকে। কাটা রাইফেল, ককটেল, চাপাতি থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক অস্ত্র এসে এখানে জড়ো হয়। অস্ত্রবাজরা সংখ্যায় অল্প হলেও ভয়ঙ্কর। সাধারণ ছাত্ররা এখন অনেকটাই জিম্মি। আত্মসম্মান রক্ষা এবং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে তাঁদের আপোস করে চলতে হয়। হল প্রশাসন টের পান কখন হলে বিশেষ কক্ষে বহিরাগতদের আগমন ঘটে। সেই সাথে বাড়ে অস্ত্রের যোগান। এর বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ শাসন জারি করা যায়। কিন্তু বাস্তব কারণেই প্রায়শ তা করা হয় না। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। হল প্রশাসন সাধারণত সে ভরসা পায় না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরও হাত পা-বাঁধা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় প্রশাসন একজন প্রক্টর ও এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর এবং তাদের জন্য অফিসার, কেরানি, পিওনসহ একটি অফিস পোষণ করছে। সর্বক্ষণিক গাড়ি রাখা হয়েছে তাদের কর্ম পরিচালনার জন্য। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ করার সুযোগ শূন্যের কোটায়। বোধগম্য কারণেই সন্ত্রাসীদের ওপর প্রক্টর মহোদয়দের নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ বাধ্য নন প্রক্টর মহোদয়দের অনুরোধ বা নির্দেশ মানতে। সুতরাং প্রক্টর মহোদয়দের কব্জিতে জোর কোথায়? তাই তাঁরা হল প্রশাসনকে কখনও সাহস যোগাতে পারেন না সন্ত্রাসবিরোধী দায়িত্ব পালন করতে। অনেক সময় বলা হয়, পুলিশ ক্যাম্পাসের ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকায় প্রবেশ করতে পারে না, পারে না হলে অস্ত্র উদ্ধার করতে বা সন্ত্রাসী গ্রেফতার করতে। আসলে এর ভিত্তি খুব শক্ত নয়। কখনও কখনও রাজনীতি ও ক্ষমতার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন পক্ষ ছাত্র নেতৃত্ব বা সন্ত্রাসীদের যে প্রশ্রয় দেয় না তা নয়। কিন্তু শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা না করার ব্যাপারে এ জাতীয় মনোভঙ্গির প্রভাব খুব বেশি নয়। আমি অন্তত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিতে পারি। যেখানে প্রশাসন পুলিশকে ঢালাও অনুমতি দিয়ে রেখেছে অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী ধরতে। কিন্তু পুলিশ অদ্যাবধি সন্ত্রাসী বা অস্ত্রের সাক্ষাত পায়নি।

উপরের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করলে বোঝা যাবে, যদি ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করতে হয় তবে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও তৎপরতারই প্রয়োজন। বক্তৃতার ভাষা বাদ দিলে এ পর্যন্ত কোন সরকার প্রকৃতঅর্থে শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত রাখতে চেয়েছে এমন মহান দৃষ্টান্ত বোধ হয় কেউ দিতে পারবেন না। আর সে সদিচ্ছা থাকারও তো কোন কারণ নেই। কারণ বিরোধীদলীয় ছাত্রদের পাশাপাশি সরকারী দলের ছাত্রদের হাতে আমরা বরাবর অস্ত্র দেখে আসছি। অস্ত্রবাজি করতে দেখেছি হরহামেশা। ওদের হাতে কি করে অস্ত্র আসে অথবা কোন্ সাহসে তারা প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে— এ প্রশ্নের জবাব কি কোন সরকার দিতে পেরেছে বা পারবে?

অস্ত্রমুক্ত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের। শিক্ষাঙ্গনে তাদের ভূমিকা বরাবরই রহস্যাবৃত।

অতীতে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি ক্যাম্পাসে অস্ত্র উদ্ধার বা সন্ত্রাসী গ্রেফতারের অনুরোধ করায় পুলিশ জানিয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেই বা উপরের নির্দেশ নেই। কারা যে পুলিশের হাত-পা বেধে রাখে তা সহজে অনুমান করা যায়। বেশ ক'বছর আগের কথা। তখন বিএনপি'র রাজত্বকাল। দুই বিরুদ্ধ দলের ছাত্রসন্ত্রাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কোন এক হলের প্রভোস্ট দায়িত্ব নিয়ে পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করেছিলেন নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করতে। কিন্তু পুলিশ নিজেদের অপারগতার কথা জানিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য নিয়োজিত থাকেন। তাঁদের নখদর্পণে থাকার কথা সব কিছু। কোথায়, কোন্ কক্ষে বহিরাগত সন্ত্রাসীর অবস্থান। কোথায় রাখা আছে অস্ত্র। হল কর্তৃপক্ষ না জানলেও তাঁরা জানেন। অনেক সময় প্রক্টর মহোদয় তাঁদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে থাকেন। সুতরাং সরকারী সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র থাকার কথা নয়। বড় লজ্জা হয় যখন আমরা দায়িত্বশীল নেতা-নেত্রীদের মুখে সন্ত্রাসবিরোধী বক্তৃতা শুনি; কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে দেখি। তাদের বোঝা উচিত সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ও ক্ষমতার মোহে তাঁরা তাঁদেরই হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছেন। রক্তাক্ত করছেন। অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন দেশের ভবিষ্যতকে। ইতিহাসই তো সাক্ষ্য দেয়— আগুন নিয়ে খেলার পরিনাম কখনও শুভ হয় না। প্রচলিত পঙক্তিমালাটি তাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'।